25 JUL 1991
তারিখ 25 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮
আজকের কাগজ
(৪৮

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষকদের রাজনীতি

আনু মুহাম্মদ

২৪।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

[দুই]

৭৩ এর আইনে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবচাইতে ইতিবাচক দিক হচ্ছে শিক্ষকদের মত প্রকাশের অধিকার, সে কারণে সংগঠনের অধিকার। অর্থাৎ একজন শিক্ষক স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রীয় সামাজিক যে কোন বিষয়ে তার মতামত প্রকাশের এবং সে অনুযায়ী সংগঠন করবার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কল্পনা করা কঠিন, একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কি করে নিজস্ব কোন মতামত ছাড়া এবং সেই মতামত-প্রকাশের অধিকার ছাড়া শিক্ষকতা করতে পারেন? শিক্ষকতা তো কোন নিছক করণিকের কাজ নয়, এখানে সৃজনশীলতা প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন, এই সৃজনশীল কাজে যে কোন বিষয়ের একজন শিক্ষককে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত মত বা আইনের বিরুদ্ধেও যেতে হয়। একটি নির্ধারিত যান্ত্রিক কাঠামো কোন শিক্ষককে শিক্ষক হয়ে উঠতে দেয় না। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় সেজন্য স্বাধীনতা বিতর্ক, স্বাধীনতা এই নিয়ম অপরিহার্য অঙ্গ। অথচ এই স্বাধীনতা পেতে বাংলাদেশের শিক্ষকদের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। অনেক শিক্ষককে আরও লক্ষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর শিক্ষকদের এই অধিকারটুকুই, এ যাবতকালের যাবতীয় প্রচারণা থেকে বোঝা যায়, শাসক শ্রেণীর প্রধান আপত্তির বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের উপর ক্রোধ এই অধিকার এখানে আছে বলেই।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে উপাচার্য যেহেতু শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন সুতরাং তাদের দ্বারা তিনি ঘেরাও হয়ে থাকেন, ব্যবহৃত হন। কথাটি সত্য। কিন্তু ৬০ দশকের উপাচার্য এবং ৭৩ এর পরের উপাচার্য দুজনের কর্মজীবনের দৃশ্যপট নিম্নরূপঃ ৬০ দশক একজন উপাচার্য ঘেরাও হয়ে আছেন আমলাদের দ্বারা, শতকরা ১০০ ভাগ সরকারের কর্তাব্যক্তি ও আমলা কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত ও ব্যবহৃত হচ্ছেন তিনি এবং ৭০ ও ৮০'র দশকে একজন উপাচার্য ঘেরাও হয়ে আছেন শিক্ষকদের দ্বারা। শিক্ষকদের একটি অংশ তাকে পরিচালনা করছেন ব্যবহারও করছেন। এটা কি বলা যাবে যে পূর্বের ব্যবহারের প্রক্রিয়াটিই উন্নততর? না কি পরবর্তী প্রক্রিয়াটির দুর্বলতাকে দূর করে আরও উন্নততর গণতান্ত্রিক পথ বের করতে হবে?

বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩ চালু হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় সকল শিক্ষক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশ নিচ্ছেন। এই অধিকারের ফলে একজন প্রভাষক বা নবীন শিক্ষকের গুরুত্ব একজন অধ্যাপকের চাইতে কম নয়। যার ফলে আগে যেমন একজন প্রবীণ আমলা শিক্ষক নবীনদের কর্মচারী হিসেবে গণ্য করতেন এবং অনেক শিক্ষকদের মধ্যেও কর্মচারী বা চাকরসুলভ মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করতো তার আইনগত ভিত্তি এখন দূর হয়েছে।

এখনও এরকম থাকতে পারে যে, "মুখ্যতঃ কর্মকর্তা গৌণতঃ শিক্ষক এরকম ব্যক্তিরা সুবিধা প্রদান বা পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিনিময়ে জুনিয়র শিক্ষকদের কর্ম[illegible] বানাতে চেষ্টা করছেন কিংবা অনেক দুর্বল বা নত[illegible] মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষকও তার ক্ষমতাশালী সহকর্মীকে 'বস' ভাবছেন বা নতজানু ভাব দেখাচ্ছেন। এ ঘটনাগুলোর আইনগত ভিত্তি নেই, তার ব্যাপকতাও আগের তুলনায় অনেক কম। তবুও এগুলো আছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে নতুনভাবে অগণতান্ত্রিকতা প্রবেশ করবার মাধ্যমে। ঘটনাগুলো ঘটতে পারছে, সকল শিক্ষকের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ কাঙ্খিত মাত্রায় প্রবল না হয়ে ওঠার কারণে কিংবা তার নিজস্ব নানা দুর্বলতা ও মোহের জন্য। ঘটনাগুলো ঘটতে পারছে রাষ্ট্রের ক্রমাগতঃ অগণতান্ত্রিক চরিত্র লাভের ফলে তার একটানা প্রভাবের কারণে।

বস্তুতঃ একজন শিক্ষক যদি বশংবদ কর্মচারী হয়ে ওঠেন কিংবা তাকে তল্পীবাহক হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তাকে দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চলতে পারে, তল্পীবহন চলতে পারে, শিক্ষকতা চলবে না। শিক্ষককে এই শিক্ষক হয়ে উঠার আইনগত সমর্থন প্রথম '৭৩ এর আইনই প্রদান করে।

শিক্ষকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কারণে তারা রাজনীতি করেন এরকম একটি কথা অনেক কূপমন্ডুক, অসহিষ্ণু অগণতান্ত্রিক কিন্তু ক্ষমতাধর ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। 'শিক্ষকরা রাজনীতি করেন' এ ধারণাটি সৃষ্টি হওয়ার কারণ কিছু শিক্ষক মাঝে মধ্যে এমন কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন যা তাদের পছন্দ হয়নি। যেমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক যদি বলেন, "স্বৈরাচারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ ছাড়া জনগণের মুক্তির কোন পথ নেই" তাহলে সেটা হবে রাজনীতি কিন্তু তিনিই যদি আবার বলেন, "সামাজিক প্রথা ও নিয়মের বাইরে যাওয়া ঠিক নয়" বা "আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে গিয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়-এগুলো অন্যদের কাজ" যার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই সমর্থন করলেন। তাহলে তাতে কোন রাজনীতি হবে না।

বস্তুতঃ যে মত প্রকাশের অধিকার শিক্ষকদের দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা তার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে করতে পারেননি এখনও, এখনো ব্যবহারই করেননি। জাতীয় ব্যাপারে শুধু নয় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম বা অসঙ্গতি সম্পর্কেও অধিকাংশ শিক্ষক নীরব থাকেন। অহেতুক ভয়, দ্বিধা, পিছুটান, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ পূরণের মোহ, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, পরাজিতের মনোভাব যেগুলো মধ্যবিত্তের মেরুদন্ডকে বাঁকা করে রাখে তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকেরাও মুক্ত নন।

কিন্তু একজন শিক্ষক নিজস্ব মতামত ছাড়া এবং তা প্রকাশ করা ছাড়া কিভাবে শিক্ষকতা করবেন? একজন শিক্ষক যদি নির্জীব এবং তল্পীবাহক হন তাহলে তিনি কি শিক্ষা দেবেন ছাত্রছাত্রীদের? বিজ্ঞানের শিক্ষককে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে প্রচলিত বিজ্ঞান বিরোধী ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় এক বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গের বিরুদ্ধে তখন তাকে দাঁড়াতে হবেই। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির যাবতীয় অসঙ্গতির ব্যাপারে নির্বিকার থেকে নিজস্ব সৃষ্টিশীল মতামত না দিয়ে কিভাবে শিক্ষাদান করবেন ছাত্রছাত্রীদের? মানবিক বিভাগের শিক্ষক শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-ও-মানবিকবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ছাড়া কি পড়াবেন ছাত্রছাত্রীদের?

এসব বিষয়ে শিক্ষাদান মানে তো মৌলিক কাজ। এই মৌলিক কাজ একজন ভাড়াটিয়া বা একজন আমলা বা একজন তল্পীবাহককে দিয়ে হবার নয়। হবার নয় বলে যুগে যুগে প্রকৃত শিক্ষকদের, বিজ্ঞানীদের, লেখকদের কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানীর বিরুদ্ধে, শাসক, শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। এ লড়াই যারা করেছেন, তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন সমাজকে, সমৃদ্ধ করেছেন ইতিহাসকে, উজ্জীবিত করেছেন পরবর্তী অনেক প্রজন্মকে।

এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের দেশে প্রফেসর আবু মাহমুদ এন, এস, এফের গুন্ডাবাহিনীর হাতে প্রহৃত

হয়েছেন। তখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ছিল না, কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ ছিল। একদল শিক্ষক ছিলেন গণতন্ত্র, প্রগতি ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে; অন্যদল কদর্য ব্যক্তি শিক্ষক নামে স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতা এবং দালালীর পঙ্কে আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। শিক্ষক হয়ে ওঠার কাজ করতে গিয়েই '৬৯-এ ডঃ শামসুজ্জোহা সরকারী বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন, ৭১-এ পাক হানাদার ও আলবদরদের হাতে শহীদ হয়েছেন বহুসংখ্যক প্রকৃত শিক্ষক। গত ২০ বছরে বহু শিক্ষক স্বৈরতান্ত্রিক সরকারী-বেসরকারী বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। বঞ্চিত হয়েছেন অনেক অধিকার থেকে। আর এগুলো করতে গেলেই বলা হয়েছে শিক্ষকরা রাজনীতি করছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একজন শিক্ষক বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে, আধুনিক জীবনবোধ পড়াতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন; তখন তিনি যদি এর প্রতিবাদ করেন তাহলে এ ঘটনাকে দলাদলি হিসেবে আখ্যায়িত করে কি পার পাওয়া যাবে? এগুলো যদি দলাদলি হয়, তাহলে শিক্ষককে দলাদলি আজীবন করে যেতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ এর আইন বস্তুতঃ বহুদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি সজীব দলিল। সমাজে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েও গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত হচ্ছে। সেজন্য আজ বরঞ্চ তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে আরও সম্প্রসারিত করার। যে সূক্ষ্ম ফাঁক ফোকড়ের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো অগণতান্ত্রিক কোটারি চক্রের জন্ম হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সরকারী নানা খেলার শিকার হচ্ছে, শিক্ষকদের মধ্যে অধঃপতিত অপশিক্ষক ব্যক্তিদের উত্থান ঘটছে বা তাদের কর্তৃত্ব কায়েম হচ্ছে তাকে রোধ করবার জন্য অধিক গণতন্ত্রায়নই আজকের তাগিদ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন এসব বিষয় তাদের বিবেচনায় আনেননি, বরঞ্চ কোন না কোনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করবার প্রশ্নটিকেই সামনে আনতে চেয়েছেন বলে মনে হয়েছে। যে কারণে সরাসরি হামলাকারী ও হত্যাকারীরা তাদের কাছে অপরাধী হয়নি, অপরাধী হয়নি তাদের মদদদাতা তথাকথিত শিক্ষক ও বহিঃস্থ শক্তি। অপরাধী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক আইন। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা এবং সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট অপশক্তিসমূহের প্রতি পক্ষপাত বস্তুতঃ একই উৎস থেকে সৃষ্ট।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এদেশে স্বাধীনতার পর থেকে গণতান্ত্রিক চেতনা ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ কিভাবে বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের একটি উর্বর ক্ষেত্র বলে (সামরিক বেসামরিক যে রূপেই হোক না কেন) শাসক শ্রেণী কখনও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। অব্যাহত সন্ত্রাস এবং অপপ্রচার বরাবর তাই বিশ্ববিদ্যালয়কে সইতে হয়। উপাচার্য নিয়োগের সুযোগ, সিনেটে ও সিন্ডিকেটে সরকারী প্রতিনিধি, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক চরিত্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এদেশের অগণতান্ত্রিক 'শাসক শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের উপর নির্ভরশীল সমর্থকগোষ্ঠী তৈরীর চেষ্টা বরাবর করে যায়। এর মধ্যে দিয়ে তারা শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয় বিতর্ক ও মতভেদকে সংকীর্ণ বিরোধিতায় পর্যবসিত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রায়নকে হাজারো কন্টকের জালে শৃঙ্খলিত করে।

এত সবের পরও বিশ্ববিদ্যালয় তার ছাত্র শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত সবচাইতে উজ্জ্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু যেসব সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বারবার কালিমালিপ্ত করছে তার থেকে মুক্ত হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধিকতর গণতন্ত্রায়নের দাবীকেই সামনে নিয়ে আসতে হবে। এই গণতন্ত্রায়ন সম্প্রসারিত করবার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষকের সচেতন, সরব ও সক্রিয় ভূমিকায় নিজেদের স্থাপন করা। শিক্ষকদের নীরব, নির্লিপ্ত কিংবা নতজানু ভূমিকা শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমলা ও অপশিক্ষকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে বা জারী রাখবে তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়, তার দায়িত্বশীল ভূমিকা ও তার বিকাশের সম্ভাবনাকে ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করবে। *শেষ*

আনু মুহাম্মদ : প্রাবন্ধিক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।